টাওয়ারে ফাইবার ব্লেড

ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

লম্বায় সাতচল্লিশ ফুট ফাইবার ব্লেড তিনটের গা বেয়ে ফাল্গুনের হাওয়া। সে হাওয়া উইন্ড ফার্মের দোতলা অফিস ঘরটার ছাদ ডিঙিয়ে আরও জনবসতের দিকে ধায়। ডাইনে বামে মস্ত বালিচর। বনবিভাগের ঝাউবন। মাঝে মাঝে চারখানা মোটাসোটা কংক্রিট পিলারের মাথায় একশো চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু টাওয়ারের উপর আট ফুট চেহারার মোটর। গা ধবধবে সাদা রঙের ব্লেড ক'খানা এদিকের আকাশকে পর পর চিরে রেখেছে।

সারা শীতটায় তো ব্লেডগুলো নড়েনি। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের জুব্বার বিকালের পড়ন্ত রোদে একবার আকাশ দ্যাখে। হাতে সিলভার গাড়ুটা নিয়ে সম্মুখের ছোট্ট ডোবার দিকে পা বাড়ায়। 'আসরের' নামাজে ওজুর আয়োজনে পানি নিতে এসেছে। দুহাজার ন'য়ে ভয়ংকর আয়লার ঝড়ে উইন্ড মিলের ভাঙা ফাইবার ব্লেডটা তো এখন ডোবার ঘাট। সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে একটু পা হাত ধুয়ে নিতে বেশ ফর্সা লাগে। বালি আধিক্যে মাটি। এই মাটি কেটে তো কনট্রোল রুমের উঁচু মেঝে তৈরি। সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস রেখা থেকে আরও উচ্চতায় যে অফিস বিল্ডিংয়ের ঘর বারান্দা। সেই ঘর-বারান্দার বনেদ খোল এ মাটিতে ভরাট করেছিল কনট্রাকটর। সুতরাং ডোবায় বর্ষার জল জমে ঘাস কলমিতে ঠান্ডা।

• একটু পাঁক সাফ হয়ে জুব্বার অফিস বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে দূরে তাকায়। ফরেস্টারের ঝাউবনের মধ্যে তো চার পাঁচখানা হাওয়া বিদ্যুতের টাওয়ারে পাখা বসানো। মাঝসমুদ্র বরাবর উপর আকাশে পশ্চিমের সূর্য। পাখা বা ফাইবার ব্লেডের গায়ে পড়ন্ত রোদের লাল আভা। জুব্বারের মনে হ'ল, 'ওদিকের টাওয়ারটার ব্লেড কি একটু একটু ঘুরতিছে...! ব্লেড এক পাক ঘুরলে মোটর ঊনচল্লিশ বার ঘোরে। বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নিচে কনট্রোলরুমে পাঠায়। ঘুরতেও পারে...এদিকের তুলনায় তো ওদিকে হাওয়া অনেক বেশি। সমুদ্র ওদিকে বাঁক নিতেই জলের বিস্তার কত ধু...ধু...!'

মাঝারি চেহারায় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের ফর্সা বউটা হাঁটে। পায়ে হাওয়াই চটি। এদিকটায় বালি অংশে মাটির উপর মোটা মোটা ঘাস বসে বেশ শক্ত উঁচু চর। হাওয়াই চটি গোড়ালিতে লাগতেই ফটাস ফটাস শব্দ। সে শব্দ কানে যেতেই গায়ে গায়ে বসবাসী দু'তিন ঘরের বউ ক'জন বেরিয়ে উঠোনে দাঁড়ায়। দু-একটা ছোট্ট আম পেয়ারা গাছ সঙ্গে জবা নয়তো লাল সাদায় বোগেনভালিয়া ফুল গাছের ডালপালা লতিয়ে টালি ছাউনির উপর। হলকলমি কিংবা বগড়াকাঁটার ঝোপ বসিয়ে বেড়া বাইরে। তারে ঝোলানো গামছা লুঙি সরিয়ে সায়মা বাখারি বোনা গেটের কাছে, 'ও সুলতাদি কাঁই...কোথা গেছিলে গো এই রোদ মাথায়?'

হাতে একটা কমদামি মোবাইল। সেটা বাম হাত থেকে ডান হাতে নিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। গোলাপি রঙের শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে সুলতা বলে, 'রোদ...রোদ তো সারা দিন চরের বালি, নোনা জল, গাছপালা পাকা পথে পাথরে তোদের মতো গা ধাসাধাসি করে কাহিল রে বোন। কতক্ষণ আর গরম তেজ ধরে রাখবে দেহে?'

কথায় রসালো সুর আঁচ পেয়ে সায়মা আঁচলে মুখ ঢাকে, 'হায় মা! কী কথায় কী শোনালি গো দিদি?' জুলেখা দড়িতে ঝুলন্ত ওড়নায় বুক হাসিমুখ আড়াল করে, 'বছর খানেক হইছে দিদির কথা শুনতে বেশ ভালো লাগে।'

ওধারে সন্ধ্যা সস্তা ম্যাকসির ছোটো হাতায় মুখ মোছে। তিন রমণী এমন ঢেউয়ে দোল খেয়ে থিতোলে সুলতা বলে, 'নারানীতলায় বড়ো বোনটার দোরে ডাক করছিল। তাই সৌখান থিকে অখন ফিরছি রে বোনেরা। তোরা সকলা ভালু আছু তো?'

মেয়েগুলোর মুখের রঙ বদলায়। বুকের ভেতর বায়ু উষুম হলেই তো উচ্চারণ বল পায়। খানিক প্রাণিত হয়ে সুলতা নৈকট্যের টানে মেয়ে...বউ তিনজনের দিকে এগোয়। সামনে কাঁটাগাছ নিরাপদে বেড়ার ওপারে তারা। মোবাইলটা পাঁচ আঙুলের মুঠোয় আঁকড়ে মনে হ'ল সুলতার, 'এইটুকু দেওয়াল ছাউনিতে কেমন গোজগাছে ওদের সংসার...। সকলে কি সংসারে...সংসারে ঢুকতে পারে...!'

উঠোনে ক'বছরের নারকেল গাছটা। ডাগলায় সবুজ পাতার ডগ নুয়ে। সায়মা দু'পা এগিয়ে যায়, 'আসবে দিদি?', বলে বেড়া-বাবলা কাঁটা বাঁধা বাতার গেটটা খুলতে যায়। গায়ে মাসে ভরাট মাথা ছাড়িয়ে ওঠা বড়ো মেজো মেয়ে দুটো নিয়ে দিনরাত থাকতে হয় তো এই সমুদ্রবালির উঁচু চরে।

ক'ঘর মানুষ নিজেরা বালুভূমি ভাগজোক করে বসবাস রচনা করেছে। সেখানে বালি বাঁচাতে ঝাউবন বাইলো বা লতকলমির ঢালা ঢালা পাতার পরে শত শিকড়ে বালি আঁকড়ে ধরে থাকে সত্তর আশি কিলোমিটার বেগের ঝড় ঝঞ্ঝায়। সে লতাগুলো প্রবল জলোচ্ছ্বাসেও বুকে আটকে রাখে নিজ দেহের বংশধারাকে ওই বালি কণাকণিকার স্তূপে। সায়মার দিকে এগিয়েও ওই বগড়াকাঁটাকে মনে হ'ল, 'শুধু কাঁটা নয়...'

সুলতার কপালে সিঁদুর টিপ আচমকা লাল হয়ে জ্বলে ওঠে সায়মার চোখে। সুতলার হাতে মোটা শাঁখা কাঁচের চুড়ি সঙ্গে তো একটা সরু নোয়া। সে দৃষ্টি সমঝে সুলতা আড়াল খুঁজতে হঠাৎ বলে, 'হ্যাঁরে বোন তোদের মেয়েরা কি অখনও ইস্কুল বোর্ডিংয়ে থাকে?'

'উঁহু। ছোট্টা'

'তাহলে সে কাঁই গো?'

'সৌ তো কলেজ যায় মোড় থিকে বাস ধরে'

'তাই...! ছোটোবেলায় তোর বরের সঙ্গে ফাইভ অব্দি তো পড়ছিলি আমি? ও ভালো

পড়া দিতো রে...তোর বর...। সৌ জন্য তোর মেয়ে ভালো...তোর বরটাও এই হাওয়া অফিসে কাজ পাইছে...'

সায়মার বুকের ভেতরটা মস্ত আকাশ হয়ে যায়। বালি...ধু ধু জল...সমুদ্রের তো সীমানা থাকে...। নিজের পুরুষের নামে...সন্তানের খুঁটিনাটিতে বাতাসে সুগন্ধের ঝলক! হুট করে সায়মা বলে, 'দিদি তোমার মেয়েটা?'

'সে এবচ্ছর তো এইটেই ফেল করেছে। নাইনে তুলে দিবে মাস্টাররা। মেয়ে গায়ে মাথায় কলাগাছের বাড়। ঠিক তার বাপের মতো—', বেশ জোরে বলতেই 'বাপ' কথাটা কানে বেজে সুলতার বুকের ভেতর পাক খায়। চকিতে মুখটা সমুদ্রের দিকে ফেরায়। কত দূর যে সে দৃষ্টি...!

হাতের মোবাইলে টুং শব্দ। স্ক্রিনে এক ঝলক আলো। হাতের তালুতে মোবাইল রেখে চোখ বোলায়, বুঝতে পারে না ব্যাটারি লো, নাকি কোনও মেসেজ!

বালির উপর ঘাস বেয়ে সবুজ থকথকে। চটি ফটফটিয়ে সুলতা এগোয়। গাড়ুতে জল নিয়ে জুব্বারের মুখোমুখি সুলতা। জুব্বার বলে, 'কিরে বউদের সঙ্গে কথা মিটলো?'

'কী আর কথা? মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের যেমন হয়? শোন জুবো'

'কী? কও?'

'এবার কি ফাগুনের হাওয়া উঠবেরে ভাই?'

'উঁ...', বলে পিছনে পাকা কনট্রোল রুমের গায়ে চার পিলারের উপর লোহার টাওয়ারটার মাথায় তাকায়।

একশো পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচুতে বড়ো বকের মস্ত ঠোঁটের আকারে সাতচল্লিশ ফুট লম্বা ফাইবার ব্লেড বা পাখা তিনখানা। সেই ব্লেড হাওয়া মেখে এখন একটু একটু নড়ছে। ধীরে ধীরে ঘুরছে মালুম হয়। নিচে সুলতার মুখে গায়ে চোখ ফেলে মনে হ'ল, ওর গোলাপি শাড়ির আঁচল মৃদু কাঁপছে। তারপর তো সাব্যস্ত করে, 'হাঁ ফাগুনের হাওয়া লাগছে রে সুলো...'

সামনে পাকা পাঁচিল ঘিরে আট ন'বিঘা বালিভূমির মধ্যে ঝাউ চারাগুলো ডালপালা ছড়িয়ে মাথা উঁচু। গ্রিল ঘেরা গেটের কাছে বোর্ডে লেখা 'প্রপার্টি অফ এ কে মুখার্জি, অ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট'। উকিলবাবুর বাগানে চেরা চেরা সবুজ পাতায় ঝাউ ডগ তিরতির কাঁপে। সেদিকে তাকিয়ে একদা সহপাঠীর উত্তরে সায় দিতে ভুলে যায়। বরং তার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আচমকা পুরুষ গন্ধ দু-নাকে। ফর্সা হাত ধরে বলে, 'তোর ডিউটি নাই?'

'এ হপ্তা নাইট—রাত আটটা থেকে সকাল আটটা...', এতদিন পর কেন যে জুব্বারের স্বর কাঁপে, হাত কাঁপে! বুক কাঁপে...!

'রাতের ডিউটি কি ভালো...রাতেই তো আমার...', বলে সুলতা আবার তাকায় সমুদ্রের দিকে। তাকায় জুব্বার। হাত ছাড়ে না সুলতা।

দুই

রাস্তা সংক্ষিপ্ত করতেই তো চরের বালি উজিয়ে চলে সুলতা। শুকনো বালির উপর দিয়ে যত হাঁটে হাওয়াই চটি বসে যায়। সুতরাং দুপুরের জোয়ারে ভেজা বালির পিঠে হাঁটে। বামে ইরিগেশান দপ্তরের তৈরি বাঁধের গায়ে বালি সিমেন্টের মশলায় ইঁটের বড়ো বড়ো ব্লক বসিয়ে মাটির বাঁধ রক্ষার ব্যবস্থা। নোনা জলোচ্ছ্বাসে প্রবল ঢেউয়ে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ফাটল! সেই ইঁটের ভাঙা ব্লক তো আচমকা পাহাড়ে পাথরের ধস ভ্রম হয়!

চরের ভেজা বালিতে সরু গর্ত মুখ থেকে লাল লাল কাঁকড়া। পায়ের শব্দে ছুটে সাড়ুৎ সুড়ুৎ গর্তে সেঁধিয়ে যায়। খানিক বালি ভেঙে এগোতেই সমুদ্র কাঠাব বা বালিগড়ির পচা খোল বালি লেপটে দুর্গন্ধ। গোলাপি আঁচলে নাকের বাতাস চাপে। জায়গাটুকু পার হয় সুলতা ডাইনে সমুদ্র থাকলেও ব্যস্ততা তো কটু গন্ধ কাটিয়ে ভালো হাওয়ায় শ্বাস নিতে। সেই তাগিদে লম্বা লম্বা পা ফেলতে শুরু করে। গায়ে বুকে হাওয়া জাপটায়! চকিতে মনে হ'ল, জুব্বার...বন্ধু জুব্বারকে দুবাহু বেড় দিয়ে গায়ে বুকে জাপটে ধরলে, কেমন লাগত...! কত দিন তেমন কোনও পুরুষকে তো..., পরক্ষণেই শাঁখা নোয়া চুড়ি ক'গাছিতে কবজি ঝাড়া দেয়। অযথা বয়ে বেড়ানোর ভার হালকা করতে চায়। আর সমুদ্রের দিকে তাকাতে ভালো লাগে না।

হাঁটার গতিতে তো পা ফেলে এগোয়। বালির পর বালি। বাম দিকে ইঁটের ব্লক বাঁধানো বাঁধ। বাঁধের ওপাশে মানুষের ছোটো বড়ো ঘর বাড়ি। রেস্ট হাউস, দু-তিনতলা বিল্ডিং, হোটেল, বাগান, দোলনা। ক'খানা নারকেল গাছের সবুজ ডাগলা। ডাবের কাঁদি ঝুলে। সে প্রাচীর সীমানায় দোতলা বাড়িটায় কাঁচ ঘেরা গ্রিলে মস্ত বারান্দা সমুদ্রমুখো। মালিক তো আমেরিকায় ব্যবসাজীবী মানুষ। বছরে একবার বউ বাচ্চাদের নিয়ে পনেরো-বিশ দিন কাটিয়ে যায়। বিদেশি কত লবনচুস বিস্কুট কলম ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে যায় যে! কী স্বাদ সে সব খাবারের...। স্থানীয় একজন কেয়ারটেকার। মাসে মাসে আমেরিকা থেকে টাকা পায় দশমাইল বাজারের ব্যাঙ্কে। বাড়িটা এখন চুপচাপ। বন্ধ কাঁচে পশ্চিমের সূর্য। কাঁচ থেকে রোদ ঠিকরে সুলতার চোখে ধাক্কা দেয়। তখনই মোবাইলে রিংটোন। বেজে ওঠে পুজোর ঘন্টা কয়েক সেকেন্ড। সবুজ বাটন টিপেই এপার থেকে সুলতার কণ্ঠ, 'হ্যালো-ও-ও'।

'কে? মা? তুমি আইসো গো। না, মাসির দোরে?'

'আরে দুঃ...মেয়েটা। আমি তো আসি ঠি।'

'কাই...কুনঠি গো...?'

'আগো...আমি আম্রিকা কট বরাবর...। এত হুড়াহুড়ি কেনি রে সুমি?'

চাপা কণ্ঠে বলে, 'অনেক কাস্টোমার লাবছে গো মা?'

মায়ের গলায় ফিসফিসানি 'ধাড়ি মেয়ে তুই আছু কি করতে? বাবুদের বসাবি তো?'

'চাবি কাই রাখছু?

'যৌখানে থাকে?' বলতে বলতে ফরেস্ট বিভাগের নতুন অর্থাৎ বছর দুয়েক আগে পোঁতা ঝাউ চারার বাগান যার নাম নিউ প্ল্যানটেশান বা নয়া প্লান্টের কাছে এসে যায়।

সাতাশ-আটাশের ছোকরা ভূগোলে অনার্স করে পাঁচ বছর চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়ে কাহিল। এখন চা-দোকানি। বিস্কুট, রঙচঙে মোড়কে কেক ভর্তি বয়ামগুলোর গা ঝাড়ন দিয়ে মুছে ঝকঝকে করে। কাচের শো-কেস'য়ে সিগারেটের প্যাকেটগুলো পরপর সাজানো। সুলতাকে আসতে দেখে, চা-দোকানি বারমুডার উপর নীল টি-শার্টের বোতাম খুলে বুকে হাওয়া লাগায়। কালো চেহারায় হাতের ঝাড়নটা নাড়িয়ে বাওটা দেয় ছোকরা চা-দোকানি। পনেরো-ষোলোর সুমিতা এদিকে তাকায়, 'মামু কি গো?' 'হাই তোর মা আসে' বলে তর্জনী দিশায় উদ্দিষ্ট মানুষকে দেখে সুমিতা দৌড়য় বালির উপর। গায়ে ভরাট সুমির কোমর বুক তুলতুলিয়ে দোলে। পাশাপাশি বসবাসে দোকানপাট। সুতরাং সম্বোধনে তো মামা। সুমিতা খানিক ছুটে থমকায়। হাতের মুঠি শক্ত করতে খেয়াল হয়, 'এইরে মামুর মোবাইল...!'

বড়ো বড়ো পদক্ষেপে প্রায় ছুটতে ছুটতে মামুর দোকানে এসে দাঁড়ায়। জোরে শ্বাস নেয় সুমিতা। সস্তায় কেনা হাফ পাঞ্জাবির রঙ চটা কাপড় আঁচড়ে সুমিতার দু'বুক ওঠে নামে। আঁচড়ে যায় দোকানি-মামুর বুকের ভেতর। একটু দম নিয়ে মেয়েটা বলে, 'এই লও তোমার জিনিস।'

'আমি কি অখন মাঙছি অউটা? মার কাছকে যা। যখোন ঘরকে যাবি ফ্যারত দিবি। যা...'

সুমিতা অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ না হলেও পুরুষের চোখের ভাষার মর্ম সমঝাতে তো খানিক উত্তরণ ঘটেছে! সেটুকু উপভোগ তো মন্দ লাগে না মাঝে মাঝে...! এই আবেশে আরও সর্বাঙ্গের খাঁজভাঁজ নাচিয়ে দুলিয়ে ছোটে। দু-একবার ফিরে ফিরে চায় মামুর দিকে...।

তিন

নয়া প্ল্যানটেশানের ঝাউচারাগুলোর ফাঁকে চারখানা খুঁটির উপর ভাঙা টিন অ্যাজবেস্টার চাপিয়ে ছোটো ছাউনি। গায়ে বাঁশ বাখারির দেওয়ালে চট তেরপোলিন ঝুলিয়ে ঘেরা। সামনে বাখারিতে পেরেক গেঁথে বেড়ার দরজায় চাবি তালা। সুমিতা বাম হাতে তালাটা নেড়ে বলে, 'দ্যাখো না বন্ধ। আমি দু-তিনবার হাত গলিয়েছি।' কথাটা জানিয়ে বেড়ার ওপাশে মাত্র ওদের জানা লুকোনো জায়গাটায় হাত গলায়। পায় না সুমিতা। তখন ডান হাতের পাঁচ আঙুলে মোবাইলটা।

'দেখি' সঙ্গে সঙ্গে সুলতা একই জায়গায় হাত বোলায়, আন্দাজ পায় না। পরে

কোমরে খুঁটে কাপড়ের ছোট্ট ব্যাগটায় হাত দেয়। টের পেয়ে মা জিব কাটে, 'ইস আমার ভুলরে। কখন পেট-ব্যাগে ঢুকিয়ে ফ্যালছি গো? শুধু শুধু তোকে বকতেছি।'

'হুঁ। আমানকে তো বকবে। আমি তো তোমার পেটের মেয়ে নয়, বানে ভেসে আইঠি, তাই?'

'কী যে বকুরে তুই?' তখন চাবিটা পাক দিতেই তালা খুলে যায়। বেড়া টানে। ভেতরে পঁচিশ ত্রিশখানা হাতলওয়ালা প্লাসটিকের লাল লাল চেয়ার। একখানা রঙিন গার্ডেন ছাতা বেঁধে ঝোলানো।

মোবাইলটা চুড়িদারের পকেটে ঢোকাতে নজর মা সুলতার, 'অউটা কার?'

'মামুর।'

'উঁ' এটুকু উচ্চারণে সুলতার বুকের ভেতর বালি খানিক সরে ঝরে যায়। ভাবে, 'শ্রীমন্ত ছোকরাটা কেমন? আমার সঙ্গে আবার মেয়েকেও...'

সুমিতা কিশোরী দেহে শক্ত হাতে উপর উপর খাঁজে বসানো চারটে চেয়ার বয়ে বাইরে আনে। সুলতা দু-হাতে চেয়ার দু'খানা টেনে বাইরে এসে বলে, 'হ্যাঁরা শ্রীমন্ত মামু তোনকে অউটা দান করছে?'

'আরে দুঃ। তোমানকে ফোন করিছিলি আমি। সৌ থিকে হাতে রইছ্যে। যাবার সময় ফ্যারত দুবো।' মেয়ের কথায় মেয়ের চোখ বুক...বুকের ভেতরটায় নজর ফেলে মা। একটু ধাতে আসে। একটু জোর পায় সুলতা, 'মেয়ের বয়েস কম। ও অনেক বন্ধু...ছোকরা বন্ধু...পুরুষ পাবে। আমার...'! গোলাপি শাড়ি আঁচল, আঁচল তলায় ব্লাউজ...তার...তারও গভীরে যে কক্ষ...শিরা স্নায়ুময় কত কোষে পিণ্ডে ব্যথা জাগায়...!

হঠাৎ হঠাৎ বায়ুহীন...রক্তহীন মনে হয় নিজেকে। চেনা সমুদ্রে জলরাশির উপরে আকাশে...মহাকাশের দিকে মুখ তুললে ভেতরটা ফাঁকা লাগে...। কপালের সিঁদুর তখন ঝরে ঝরে পড়ে নিচে...। মনে হ'ল, 'এমন এভাবে...কত বচ্ছর যে অপেক্ষা...! লোকমুখে শুনি তো বারো বচ্ছর, দিন কাটানো...রাত কাটানো...! সে রাত যে কত বড়ো...।'

চেয়ার দু-হাতে বয়ে নিয়ে বালি ভাঙে দু-জনে। ডাইনে সমুদ্রে ছোটো ছোটো ঢেউ। ভাটায় তখন চরের বালি ঢাল থেকে অনেক নিচে জল...জলের রেখা। দক্ষিণের নোনা জলে গা-ভিজিয়ে হাওয়া বয়ে আসে ঝাউবাগান চরের বালিতে। বালির উপর চা-বিস্কুটের দোকান, শাঁখা, শঙ্খ, ঝিনুক মালা, গহনার দোকান পেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে চেয়ার টেবিল সাজিয়ে হাত মুখ ধোয়ার বেসিন টয়লেট ব্যবস্থায় হোটেল কাম রেস্তোরার মেনু বোর্ডের গায়ে। আশপাশের গাঁয়ের মধ্যবয়সী পরিচারিকারা শাড়ি থান ত্যাগ দিয়ে এখন টাইট ফিটিং চুড়িদার পাঞ্জাবি পরে খদ্দের ডাকে, 'আসুন গরম গরম মাংস এউখানে রেডি। একবার ভাজা মাছ টেস্ট করে যান এউখানে...', তখন ভাত জলে ভারি বুক টলমল করে।

হাওয়ায় হাফ পাঞ্জাবিতে সুমিতার গলা নরম বুক ফুটে ওঠে। দু-হাতে চেয়ার চারটে ঝুলিয়ে এগোয়। পিছনে তো চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের সুলতা। দু-হাতে চেয়ার দুটো। সুমিতা বলে, 'মা দ্যাখছো ওপাশে শ্যামল খাটুয়া আগেই চিয়ারগুলো কেমন পাতছে?'

'চিয়ারগুলো নীল মনে হয়...!'

'হুঁ। তাই তো। খাটুয়াদের মাছের আড়তদারি আছে, না...?'

'আছে তো। ব্যবসাদার মানুষ। আমার সীমানার দিকে টেলে এসে চিয়ার পাতে নাই তো!'

'মা দোকান কমিটি যা ভাগ দেখিয়ে দিছিলো, সে কি লোহার রড সিমেন্টের পিলার গেঁথে সীমানা চিহ্নিত করে দিছে এই চরের বালিতে?''

'তাই তো? মুখের কথা আর বালির বাঁধ ধসতে...ধুয়ে যাইতে কতক্ষণ...।'

দমকা হাওয়ায় সমুদ্রে ঢেউ ওঠে। সে ঢেউ চরের বালিতে গড়ায়। ঢেউ ফেরে...ফেরে তো বালির কাদা। চকচকে অভ্রকণাও।

সূর্য আকাশ বেয়ে সমুদ্র ডিঙোয়। দিগন্তরেখায় আগুন রঙা মস্ত সিঁদুর বিন্দু হয়ে সূর্যটা আটকে। সে দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে, 'সুমুদ্দুরের কি মানায় ওই সিঁদুর বিন্দু বহন করতে...! কত মেছুড়ে জেলে মাঝি ট্রলার ড্রাইভার সারেঙের বউদের কপালের সিঁদুর তো মুছে লিছে...কত বিবির বরদের তলিয়ে গিলে লিছে...। গোটা ট্রেলার সুদ্ধু মানুষগুলাকে ডুবিয়ে নিলে...আয়লার ঢেউ কাটিয়ে ভাসিয়ে দেশে ফিরত দিলে...আমার মানুষটা আজও দেশে ফিরে কাই গো...! নাকি মাছ কুমিরের পেটে গিয়ে মাছ হাঙর হয়ে পাহাড়...জঙ্গলের গাঙ সমুদ্রের জলে সাঁতরাইতেছে...'

শেষ রশ্মিতে চেয়ারগুলো হঠাৎ টকটকে লাল। সেই লালের দিকে শ্রীমন্তের নজর যেতেই চা দোকান থেকে চেঁচায়, 'ও সুলতিদি আরে শুনো।'

মেয়ে সুমিতা চেয়ার ক'টা নিয়ে খানিক তফাতে। মা চেয়ার জোড়া বালিতে রেখে দোকানের দিকে পা ফেলে, 'সুমি এ দুটা লে যাবি গো মা। আমি অক্ষুনি আইঠি।'

ক'পা এগিয়ে গোলাপি আঁচলে কপালের সিঁদুর মুছে নেয় সুলতা। তখন সূর্যটা সমুদ্রে ডোবে। আঁধার নামে ঘন হয়ে। সুলতা নিজেকে পুরুষহীন মুক্ত রমণী বানিয়ে তোলে। শ্রীমন্ত কতবার যে গায়ের কাছে বসে গা বুক থেকে চোখ নিয়ে সিঁথির দিকে চেয়ে বলেছে, 'সুলতাদি, তোমার ওই কপালের লালে কে যেন চোখ রাঙিয়ে দাঁড়ায় গো...?'

'তাই! কে? সুমির বাপ...বিজয় গুছাইত...! আচ্চা...মুছে দিইঠি। হইছে...' বলে শ্রীমন্তর গা ঘেঁষে কোলের উপর হাত রেখে ছিল। কিন্তু শ্রীমন্তের দেহে সে জোয়ার থিতিয়ে মৃদু ভাটা ধরে। সেদিন সুলতা আকাশ...সমুদ্রের দিকে চেয়ে মনটা রাখার ঠাঁই না পেয়ে নিচে...নিজের ডাইনে বামে তাকায় বালি...চরের বালিতে! কত রকমের পাখি কাঁচা মাছ খুঁটছে পেট ভরাতে। গাঙ চেঙো.. লাল লাল ফুলের মতো কাঁকড়া বা হারমিট ক্র্যাবগুলো

মুহূর্তে তিরতিরিয়ে ছোটে। গর্তের আশ্রয়ে সেঁধোয় আপাত নিরাপত্তায়। সেদিন মনে হয়েছিল সুলতার, 'পুরুষের আদর যত্ন তো রমণীর পিপাসার জল...পরানের বায়ু গো...'!

এখন পায়ে পায়ে বালি ভেঙে এগোয় সুলতা। কোমরের ছোটো ব্যাগে মোবাইল। দু-পাঁচ টাকা। আর ইন্দিরা আবাস প্রকল্পে পাওয়া ঘরটার এক সেট চাবি। শ্রীমন্তর দোকানে দুধসাদায় সি এফ এল আলো, 'ডাকছিলি কেনি গো ভাই?'

'আগো ভিতরে আইসো সুলোদি।'

সুলতা আঁচলে আর একবার ফর্সা মুখটা মুছে পরিচ্ছন্ন হয়। আঁচল ঘুরিয়ে টেনে ভরাট বুকে মনোরোমী। চটি সামলে ভিতরে দাঁড়ায়। দোকানের আলোয় সুলতার কপালে লালচে আলো। ফাগুনের হাওয়া সুলতার পিঠের চুলে।

'হাঁ। কইছিলি কী? এই বাবুরা ক'জন তোমার ওদিকটায় বুসবে।'

'হা বুসুক। আমার সঙ্গে আসুন গো বাবুরা।'

'আর বাবুদের অউখানে যদি ক'কাপ চা...', উচ্চারণের আগেই হাওয়ায় বাক্যের ছোঁয়া পায়। সঙ্গে সঙ্গে জনা দুই মধ্যবয়সীর হাত ধরে টানে, 'আসুন গো আপনারা। মানুষের ঘরে মানুষ আইলে পরথমে বুসতে কয়। তারপর কথা শুরু...'। পিছনে যুবকদের মুখে হাসি দেখে একেবারে তাদের গা-ঘেঁষে হাত টেনে বুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটে, 'চলুন গো ভাই আমি তো আজকাল বোন...দিদির মতো...'

যুবকটির মনে হ'ল, 'অন্তরে কত কী সরানো থাকে, এ তো বুক ছুঁয়ে বুকের টান বোঝাচ্ছে...! কত প্রাচীন মুদ্রা! স্থান নেই...কাল নেই...।'

দূরে হ্যালোজেন টাওয়ারের আলো গড়িয়ে এদিকে আসে। অন্ধকার নয়, তবে ফিকে আঁধার। মায়ের সঙ্গে পাঁচ ছ'জন পুরুষ। তার মধ্যে তো ক'জন বেশ যুবক। যুবকদের দেখে সুমিতার গা বুক চিক্কির দিয়ে নিম্নাঙ্গে ঢেউ তোলে। পরক্ষণে মস্তিষ্কে শিরশিরিয়ে যায়, 'ওরা আমাদের এউখানে তো...!'

মা বলে, 'সুমিরে বাবুদের চিয়ার পেতে দেগো। আমি আর ক'খানা আনি।'

মধ্যবয়সী পুরুষটি সামান্য ঢলা প্যান্ট শার্টয়ে কামানো গাল। স্বল্প কাঁচা পাকা চুলে স্বাস্থ্যবান। তার কবজি কনুইয়ের ত্বকে সুলতার মোলায়েম না হোক, এক রমণীর ঘন পাঁচ আঙুলে আঁকড়ানো চাপ লেগে আছে। তার গমন পথে তাকিয়ে বলে মধ্যবয়সী পুরুষ, 'এই যে আপনি...তুমি পারবে? না, আমিও সঙ্গে যাবো...'

নিজের পুরুষ ছাড়াও এই ক' সিজিনে কিছু ভালো জামাকাপড়ে সেন্ট স্প্রে মাখা বাবু মানুষ...তাদের বউ মেয়েদের তো দেখেছে...! সুতরাং খুব সহজে বলে, 'আইসো গো বাবু...আইসো।'

পিছনে যুবক সহকর্মী বলে, 'যোগেশদা ব্র্যাভো...প্রসিড।'

ক'মাস তো কথাগুলো প্রায়ই শোনে। ফাইভ সিক্স অবধি পড়া মেয়ে খানিক তো আঁচ

করতে পারে। পায়ে পায়ে এগোয় যোগেশবাবু আর সুলতা চেয়ার গোডাউনের দিকে। এপাশে হ্যালোজেনের আলো পৌঁছোয় না। আঁধার ঘন। সুলতা হাত ধরে।

'আপনার এ জায়গা...সমুদ্র ভালো লাগেঠে...?'

'কেন লাগবে না? কত সুন্দর চর...বাগান...সমুদ্র...মনে হয় সারা রাত গায়ে হাওয়া মাখি...'

চেয়ার দুটো টেনে বাইরে আনে সুলতা। যোগেশ বালির উপর বসে। আকাশে তারারা ক্ষীণ থেকে ক্রমে আলোময়। সমুদ্রে ছোটো বড়ো ঢেউ জাগে। সুলতা কাছে আসে, 'বাবু যাবেন নি গো?'

'দুস্। তুমিও বসো আমার কাছে', এবার যোগেশ হাত ধরে টেনে বসায় গায়ের পাশে। সুলতা ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, 'বাবু এদিকে বেশি রাত ভালো নয়...'

'কেন? বাঘ, না কুমির...'

'তাও নয়।'

'তবে আমার হোটেলে যাবে?'

'আপনারা ছ'জন ডাঁটো পুরুষ।'

'আমি একা আলাদা ঘর নেবো,' বলে সুলতার পিঠ ধরে টানে। কোনও আদর নয়, আবেশ নয়...। একেবারে কোলের কাছে।

'সব হোটেল যে চিনে...জানে...?'

'তাহলে তোমার ঘরে?'

'আরও ক'দিন থাকবেন তো? সমুদ্র...ঢেউ...সানরাইজ দ্যাখবেন নি? টাটকা মাছ ভাজা...পার্শে...ডিমওলা কাঁকড়া...বাগদার মালাই...'

যুবক সহকর্মী বিপ্লব ডাকে, 'যোগেশদা-আ-আ...'

বিপ্লব উঠে আসতেই সুজয়ের পাশে সুমিতা চেয়ারে। কথার পর কথা তখনও ভাসে। নোনা হাওয়ায় গাঁট গ্রন্থি আলগা, 'তোমরা ক'জন এক ক্লাসে?'

'বাহাত্তর জন।'

'অ্যাতো ছাত্র! ক'জন ছাত্রী?'

'আটাশ ঊনত্রিশ জন মেয়ে।'

'তোমরা জিনসের প্যান্ট শার্ট, টপ পরো?' বলে তখনও সুমিতার হাতটা ধরে। কিশোরী বুকের নৈকট্যে আভাস পায়।

'উঁহুঁ। চুড়িদার পাঞ্জাবি ওড়না, আর শাড়ি..., এই আমাদের ড্রেস'

'বাহ। ভালো মেয়ে', সুজয় একটু থুতনি ধরে নেড়ে দেয়। এক বারও হাত দিয়ে বাধা দেয় না সুমিতা। বা মুখটা সরায় না। ঘন্টায় তাদের চেয়ার পিছু রেট এই নতুন হাওয়ায়

বাড়ছে। দোকান কমিটির মিটিংয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। বাজারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের চাঁদার হার বৃদ্ধি করতে হবে।

খাটুয়ার কর্মচারী ওপাশে ভ্রমণার্থীদের বলে, 'আসুন একদম নতুন চেয়ার। বসে আরাম। ঘন্টায় মাত্র কুড়ি...রুপিজ টোয়েন্টি...'

ভাড়া শুনে উৎসাহীরা হাঁটতে হাঁটতে বালিচরে অনেক দূর...!

নতুন নীল চেয়ারে বসে খাটুয়ার কর্মচারী ভাবে, 'বাবুকে জানাতে হবে, খদ্দের ধরতে কায়দা বের করুন...।'

ফড় হাঁসগুলো সাদা সাদা ডানা গুটিয়ে ঝোপের আড়ালে চুপটি মেরে ঝিমোয়। সারা দিনটা নোনা জলে ভেসেছে। দাপিয়েছে। মেছো ট্রলারের পাশে পাশে ভেসেছে মুড়ি শুটকি মাছ ভাতের দানার লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে ফড় হাঁস। বিস্কুট ভেঙে হাওয়ায় ছুঁড়ে দিলেও তা সাদা ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে এসে গোলাপি ঠোঁটে ঠিক ধরে নেয়। জলের আকাশে তখন ধবধবে সাদা পাপড়ি মেলে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল।

যেহেতু সন্ধে এখন ঘনতর অন্ধকারে, একজন কনস্টেবলের সঙ্গে ছোকরা সিভিক পুলিশ। গায়ে সাদা গেঞ্জি। মাথায় হলুদ টুপি। চার ব্যাটারি টর্চটা জ্বেলে সোজা সমুদ্রের দিকে ফেলে। আলোর রেখা ঢেউয়ে চিকমিকিয়ে ফণা।

বালিচরে মানুষজন। হাওয়ায় পাশাপাশি বিস্রস্ত যুবক যুবতী, রমণী পুরুষ নিজেদের গুছিয়ে নেয়। টর্চের আলো সমুদ্রে নাচে। জলকণায় আলোককণা মাখামাখি হয়ে ভাসে।

চরাচরে রাত বাড়ে। ঝাউ বাইন গেঁমুয়া কাঁটা গাছ মেটে চরে চিংড়ি শাক, লাল গিরা শাক, ঘাস লতাপাতার গায়ে অন্ধকার নিয়ে নিথর। আকাশে দূর নক্ষত্র ঝিমোয়। পাশ ফিরে ঘুম ফেঁসে হঠাৎ মনে হ'ল সুলতার, '...যারা...যে পুরুষরা আমাকে কাছে টানে, কেউ তো বুক চমকিয়ে কাঁপে না...! এরা তাহ'লে ধরেই নেয়, সহজে সব পেয়ে যাবে...এমন বিশ্বাসে এক ঠে...! কিন্তু আজ জুব্বার...ছোটোবেলায় সহপাঠী জুব্বার...হাতটা ধরতেই এমন চোখ মুখ বুকে কেঁপে উঠলো কে নি যে...! সৌ বন্ধুটা আমাকে কত দামি ভাবছে এত বচ্ছর ধরে...তাই না...!'

কাচা শায়া শাড়ি পরে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। হাঁটতে হাঁটতে শৈশবের ছোটো প্যান্ট ফ্রকে ঢুকে যায়। মাথায় লাল ফিতের ফুল। রথীনবাবুর প্রাইমারি স্কুলের দাওয়ায় ক্লাস ফোর...। এমন গরমে বুনো কাঠের চেয়ারে বসে। নিত্য কাচা সাদা কাপড় ফতুয়া গায়ে। ফর্সা মানুষটার পায়ে একজোড়া রাবার স্যান্ডেল। গাঙ ধারে বুনো ঝুপি ঝাউ ডালের বেত নাচিয়ে কইত, 'তোরা বই শ্লেট গুছিয়ে লাইনে দাঁড়া। নে, বারো কে...?' সমস্বরে আওয়াজ উঠত, বা-রো-ও।

'বারো দু গুণে?'

'চব্বিশ।'

.....

'আট বারোং?'

ছিয়ানব্বই

.....

'বারো দশকে?'

একশো কুড়ি...

তখন তো আকাশে থোকা থোকা সাদা মেঘ। চরের বুকে বালির স্তূপ জমে জমে বালির পাহাড় বা বালিয়াড়া। ভাবতে ভাবতে সুলতা যে পথে হাঁটে...। চোখের সামনে জলোচ্ছ্বাস রেখার থেকে আরও উঁচুতে বনেদ বারান্দায় চার-পাঁচখানা কক্ষে পাকা বিল্ডিংয়ে অফিস ঘর। ভেতরে কাঁচ ঘেরা জানালা। বড়ো চেহারায় ভোল্টেজ কনট্রোল বক্স। কম্প্যুটার কত কী যে...!

বিল্ডিংটার কপালে লেখা 'ডবল্যু বি আর ই ডি এ'। পিছনে তিন-পাখার টাওয়ার মাথায় রাতের আকাশ। একটা তারা খসে পড়ে সমুদ্রে। বিল্ডিংয়ের গ্রিল গেট ধরে ঝাঁকুনি দেয়, 'জুব্বার'...

বারান্দার দেওয়ালে ছাপা অক্ষরে কী যে লেখা...! আবার ঝাঁকায়, 'জুব...বার রে...'

কালো লাইনগুলোর গায়ে হাওয়ায় আলো চলকায়, 'উই ডু নট মেক ইলেকট্রিসিটি, উই কনভার্ট আদার এনার্জি সোর্সেস ইন টু ইলেকট্রিকাল এনার্জি...'